সমসাময়িকের চোখে ‘লালসালু’

রশীদ করিম

মহব্বতনগর গ্রামের অধিবাসীদের ধর্মান্ধতাকে পুঁজি করে ভণ্ড - পীর মজিদ যে তারাবাজি দেখিয়ে আমাদের সকলের চোখ টেরিয়ে দিল। লালুসালু উপন্যাসটির কৃতিত্বের আসল দিক সেটা নয় --- বইটির আসল কেরামতি অন্য জায়গায়। একটা গোটা গ্রামকে দিনের পর দিন বছরের পর বছর, বোকা বানিয়ে রাখবে, গ্রামের লোকেরা অতটা সরলমতি নয়। হাসুনির মা উপন্যাসটিতে একটি গুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তার বুড়ো বাপের মনের কথা তো লেখক উপন্যাসটির ২৩ পৃষ্ঠায় বলেই দিয়েছেন। ‘একটা বিষয়ে গোলমাল নেই তার মনে। অন্তরের শত্তিতে মজিদ ব্যাপারটা জানতে পারছে সে কথা সে বিশ্বাস করে না।’

পুরোপুরি বিশ্বাস করে না খালেক ব্যাপারীর নিঃসন্তান বড় বৌ-টিও। করলে সন্তানলাভের আশায় পোড়াপানির জন্যে সে আওয়ালপুর -এ যেন নতুন পীর সাহেবের কদম মুবারক দেখা গেছে, তাঁর কাছে লোক পাঠাবার জন্যে স্বামীর কাছে ধর্ণা দিত না ।

মহব্বতনগরের আরো বহু লোকেই করে না। মজিদ - পীরে তাদের বিশ্বাস অটল থাকলে, তারা দলে দলে আওয়ালপুর - এর নবাগত পীর সাহেবের দরবারে শরিক হবার জন্যে মিছিল করে বেরিয়ে পড়ত না। অবশ্য এই যে নতুন পীরের দিকে পদযাত্রা, তার ক্ষিপ্রতার সবটাই বিশ্বাস - এর জোর থেকে আসেনি। নিস্তরঙ্গ জীবনে একটা নতুন জিনিস ঘটেছে। তাই মজা দেখবার ইচ্ছাটাও এই নতুন প্রাণ - চাঞ্চল্যের পেছনে কাজ করছে। মোটের উপর, গ্রামের লোকেরা সরলও নয়, গ্রামের মাতব্বর - শ্রেণির লোকেরা বাইরে থেকে হঠাৎ - আসা এক সম্পূর্ণ আজনবিকে আধিপত্যের সিংহাসনটি স্থায়ীভাবে ছেড়ে দেয় না। ‘ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি, চলন্ত ট্রেনের জানালা থেথে দেখা দৃশ্য হিসেবে ঠিকই আছে। কিন্তু গ্রাম্য সমাজের প্রকৃত পরিচয় লাভের জন্যে আমাদেরউপস্থিত হতে হবে শরৎচন্দ্রের ‘পল্লী সমাজ’ -এর দ্বারে। মাতব্বররা যেখানে বসে আছেন সেখানে উঠবার জন্যে তাঁদের অনেক মতলববাজি, ট্যাঁকের অনেক কড়ি খরচ করতে হয়েছে, আঁটতে হয়েছে অনেক ফন্দি - ফিকির। সেখান থেকে অন্য কারো হাঁকে সুড়সুড় করে নেবে আসবেন, তাঁরা ঠিক অতোটা ফরমান - বর্দার বান্দা নন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ -এর ‘লালুসালু’ উপন্যাসটির এই দিকটাকে একটাফ্যান্টাসি মনে করলে, গ্রন্থটির মূল্যায়নের জন্যে অন্য যুত্তি ও অন্য দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করা হত। কিন্তু ফ্যান্টাসি রচনা করা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ -এর উদ্দেশ্য ছিল না তিনি উপস্থিত করতে চেয়েছেন একটি বাস্তব চিত্র।

আগেই বলেছি, উপন্যাসটির আসল বাহাদুরি অন্য জায়গায়। স্ত্রী - পুষের সম্পর্কের রহস্য উন্মীলনে। এবং সেখানে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর সূক্ষ্ম হাতের মিহি কাজ দেখিয়ে দিয়েছেন।

মজিদ যে একজন রসিক ও তালেবর ব্যত্তি সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে লেখক আমাদের বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখেননি। ৯০-এর পৃষ্ঠায় লেখক বলেছেন ‘পুকুরে গোসল করে সিত্ত বসনে উঠানে দাঁড়িয়ে রহীমা যখন চুল ঝাড়ে তখনো চেয়ে চেয়ে দেখে মজিদ। বিছানার পাশে যে দেহটির তাল পায় না, সে দেহটিই এখন সিত্ত কাপড় ভেদ করে অদ্ভুত সুন্দর হয়ে ওঠে। তার চোখচকচক করে।’

গলা কেশে মজিদ বলে, ‘খোলা জায়গায় অমন বেশরমের মত দাঁড়াইও না বিবি।’

যদিও ধারে কাছে কেউ নেই, দর্শক ও অ্যাডমায়ারার একা মজিদই --এবং যদিও মজিদ রহীমাকে এক ভারবাহী গৃহপালিত জন্তুর মতোই ব্যবহার করে, --তবু এই উক্তিতে ঈর্ষা কাজ করছে, এবং স্বত্বাধিকারীর মনোভাব। অবশ্য একমাত্র ধর্মপত্নী রহীমার রূপেই মজিদের দৃষ্টি স্থির অচঞ্চল হয়ে নেই। সে বিধবা হাসুনির -মা'র রূপেও মর্যাদা দিতে জানে। আর একবার নিকায় বসবার পরামর্শ শুনে হাসুনির মা বলে, 'দিলে চায় না বুবু' ---তবু আমরা জানি, তার শরীরে এখনো রক্ত নৃত্য করে, তাই তার স্বগতোক্তি শুনতে পাই 'নিকাকরবি মাগি, নিকা করবি' এবং নিজের প্রতিই এই প্রশ্নটি ছুঁড়ে দিয়ে সে এক 'তেল চকচকে জোয়ান ছেলের' কথা চিন্তা করে। 'তেল চকচকে জোয়ান কালো ছেলে'র পর কারো আর সন্দেহ থাকে না, হাসুনির মা'র শরীর এখনো কালবৈশাখীর তাণ্ডবের দ্বারা পিষ্ট হতে চায়।

উপন্যাসের ৩৫ ও ৩৬ পৃষ্ঠায় একটি অবিস্মরণীয় দৃষ্টি দেখতে পাই, যার পুরো তাৎপর্যকে গ্রহণ করতে হলে, দৃষ্টিটাকে একটু উস্কে নিতে হবে।

আসুন, এখানে লেখকেরই ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করি

পৌষের শীত ...

শেষ রাতের দিকে মজিদ ঘরে থেকে একবার বেরিয়ে আসে। খড়ের আগুনের উজ্জ্বল আলো লেপাজোকা সাদা উঠানটায় ঈষৎ লালচে হয়ে প্রতিফলিত হয়ে ঝকঝক করছে। সে ঈষৎ লালচে উঠানের পশ্চাতে দেখে হাসুনির - মাকে, তার পরনে বেগুনি শাড়িটা। যে আলো সাদা মসৃণ উঠোনটাকে শুভ্রতায় উজ্জ্বল করে তুলেছে, সে আলোই তেমনি তার উন্মুক্ত গলা - কাঁধের খানিকটা অংশ আর বাহু উজ্জ্বল করে তুলেছে। দেখে এখানে মজিদের চোখ চকচক করে।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে মজিদ আশপাশ করে।....

'এক সময়ে মজিদ আবার বেরিয়ে আসে। এসে কিছুক্ষণ আগে হাসুনির মায়ের উজ্জ্বল বাহু - কাঁদ - গলার জন্যে যে রহীমাকে সে লক্ষ করেনি, সে রহীমাকেই ডাকে। ... রহীমা ঘরে এলে মজিদ বলে, 'পা - টা একটু টিপে দিবা?'

এ গলার স্বর রহীমা চেনে।

অন্ধকারে সাপের মতো চকচক করে তার চোখ। ...কাউকে সে জানাতে চায় কি কোনো কথা? তারই দেওয়া বেগুনি রঙের শাড়ি পড়া মেয়ে লোকটিকে --- খড়কুটোর আলোতে তখন যার দেহের কতক অংশ জ্জ্বলজ্জ্বল করেছিল উজ্জ্বল লালিত্যে, তাকে একটা কথা জানাতে চায় যেন।'

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ থেকে উদ্ধৃতি এখানেই শেষ। আমরা বুঝতে পেরেছি মজিদ যাকে 'একটা কথা জানাতে চায় যেন' সেই ব্যক্তিটি কে, এবং কথাটাই বা কী? ব্যক্তিটি অবশ্যই হাসুনির মা। এবং হাসুনির মা - কে মজিদ যে কথাটা জানাতে চায়, তা এই যে, পৌষের শেষ রাত্রে মজিদ যাকে শয্যায় আহ্বান করল সে দৃশ্যত রহীমা হলেও, আসলে হাসুনির - মা। হয়তো অন্য কোনো দিন। অন্য কোনোখানে। অন্য কোনো লগ্নে।

এত তো গেল মজিদের ইচ্ছা - অনিচ্ছার কথা। হাসুনির মায়ের কোনো প্রতিক্রিয়ার কথা লেখক জানাননি। সে প্রতিক্রিয়াটা আমি এখানে আরোপ করতে চাই।

মাজিদের মিলনস্পৃহা জাগ্রত হয়েছে রহীমাকে দেশে অবশ্যই নয়। হয়েছে, সেই পৌষ রাত্রে খড়কুটোর নম্র কিন্তু মেদুর ও অন্তরঙ্গ আলোয় কর্মরতা হাসুনির - মায়ের অনাবৃত কণ্ঠ ও বাহু দেখে। সে কথা হাসুনির - মাও বুঝতে পেরেছে। মেয়েরা পারে। সেখানে কোনো অভিজ্ঞ চক্ষুষ্মান পুষ উপস্থিত থাকলে, সে -ও পারত। হাসুনির মা এ কথাও বুঝেছে, মজিদ আবার বেরিয়ে এসে যখন রহীমাকে আহ্বান করল। সে ডাক আসলে হাসুনির মায়েরই জন্যে।

আরোপ যখন করছি, আরো একটু অগ্রসর হতে দোষ কী?

কেন ডাকা হল, এবং ভেতরে তখন কী হচ্ছে, সে কথা হাসুনির মা অবশ্যই জানে। বাইরে খড়কুটোর মৃদু তাপের সামনে বসে থেকে হাসুনির মা সে দৃশ্য দেখেছে। এই দৃশ্যটির ব্যাখ্যা আমরা আরো একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। মজিদ যখন অন্দরে রহীমার সঙ্গে মিলনে রত, তখন বাইরে বসে থেকে হাসুনির - মাও তার সর্বশরীর দিয়ে সেই স্পন্দন ও মন্থনের সুখানুভূতি লাভ করছে। সে জানে মজিদ তাকেই ভোগ করছে। আমার মতে এটাই হওয়া উচিত হাসুনির মার অন্তরিন্দ্রিয়ের কাহিনি।

৩৬ পৃষ্ঠায় আমরা দেখেছি রহীমা-র মা আবার উঠোনে বেরিয়ে এসেছে। রহীমা ও হাসুনির - মা, কেউ কারো দিকে চোখ

তুলে তাকাতে পারছে না।
হাসুনির - মা'র কথা তো হল। এবার তার বুড়ো বাপ - মা'র যে উপ্যাখ্যানটি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ উপহার দিয়েছেন সেটির কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। অবশ্য, যে - কারণেই হোক, এই আখ্যানটি 'পুতুল নাচের ইতিকথা' উপন্যাসটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কী যেন নাম ছিল সেই দুটি নর - নারীর? মিষ্টিদিদি আর যাদব? ভালো মনে নেই।
হাসুনির মায়ের বুড়ো বাপ - মাকে মনে পড়ে? যাদের সারা দিনের কাজ ছিল ঝগড়া করা? ঝগড়া বললে তো কমই বলা হল। চুল ছেঁড়াছিঁড়ি করা। এদের আপাত সম্পর্ক একটা। পরে জানতে পারি, পরস্পরের হৃদয়ের আসল সম্পর্কটি স ম্পূর্ণ বিপরীত।
লেখকের ভাষাতেই শু করি।
'বুড়ো বাপ তার ঢেঙা, দীর্ঘ মানুষ। মা ছোটোখাটো, কোঁকড়ানো। কিন্তু দু'জনের মুখে বিষ। ঝগড়া - ফাসাদ লেগেই অ াছে। তবে এক - এক দিন এমন লাগে যেন খুনাখুনি হবার জোগাড়। ঢেঙে লোকটি তেড়ে আসে বারবার, ঘুণধরা হাড় কড়কড় করে। বুড়ী ওদিকে নড়ে চড়ে না। এক জায়গায় বসে থেকে মাথা ঝাপিয়ে ঝাপিয়ে রাজ্যের গালাগাল জুড়ে দেয়। গালাগাল দিয়ে বুড়োকে যখন বিন্দুমাত্র ঘায়েল করতে পারে না, তখন শেষ অস্ত্র হানে।
---ওরে মরার ব্যাটা, তুই কি ভাবছস? বুঝি পোলাগুলো তোর জন্মের? আল্লা সাক্ষী, হেওলো তোর জন্মের নয়।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ থেকে উদ্ধৃতিতে এক মিনিটের জন্যে বিরতি নিয়ে এখানে একটা কথা বলে নিই। এই বৃদ্ধ - বৃদ্ধার 'ল াভ - হেট' সম্পর্কের যে চিত্রটি আমরা দেখছি, এবং যার আশর্চ্য পরিণতিটা আমরা পরে দেখছি, বাংলা উপন্যাসে তার সঙ্গে তুলনীয় কোনো অভিজ্ঞতার কথা আমরা পাঠ করিনি। তবু কেন বললাম 'পুতুলনাচের ইতিকথা'-র কথা? না, দৃশ্যত সেরকম কোনো মিল নেই। তবু কোনো দুর্জ্ঞেয় কারণে আমার মনে পড়ে যায়। হয়তো আমার মনেরই দোষ।
আসুন, আবার সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ -এর কাছে আমরা ফিরে যাই।
স্ত্রীর কথা শুনে 'চেলাকাঠ নিয়ে ছুটে যায় বুড়ীকে শেষ করবার জন্যে (পৃ. ২১২) অথচ সেই সঙ্গেই বৃদ্ধের মনে পড়ে 'অ াগে যৌবনে কেমন হাসিখুশি মেয়ে ছিল সে। স্থির থাকতো না এক মুহূর্ত, নাচতো কেবল নাচতো, আর খই - এর মত কথা ফুটতো মুখ দিয়ে।'
বুড়ো আরো ভাবে 'বউ আজ শুধু কংকাল, পচনধরা মাংসের রদ্দি খোলস -- তাকে নিয়ে সে কীবা করবে?'
বিভিন্ন বিরোধী ভাবনায় সংঘাতের সময়, কোনো একটি বিশেষ ভাবনায় প্রভাবের প্রাধান্যের মুহূর্তে, বুড়ো স্থির করে, 'উঠে গিয়ে চেলাকাঠ দিয়ে এ মুহূর্তেই বুড়ীর আমসিপানা মুখখানা ফাটিয়ে উনিয়ে দিয়ে আসে।'
হয়তো তখনই বিপরীত দিক দিয়ে এক কোমল ভাবনার তরঙ্গ আসে। সে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে স্থির হয়ে শুয়ে পড়ে । সেই সময় বুড়ি যে কথা বলে তা শুনে আমরা বুঝতে পারি, বুড়ি ভয় পেয়েছে।
'দেখতো, ব্যাটা কি মরলো না কি?'
যখন সে জানল বুড়ো মরেনি তখনো আমরা বুঝতে পারি বুড়ি সে জন্যে খোদার কাছে কৃতজ্ঞ।
কিন্তু মুখে বলছে, 'তাই ক। আমার কি তেমন কপালডা।'
আমরা জানি, বৃদ্ধা যখন বৃদ্ধকে বলেছিল যে বৃদ্ধার সন্তানদের জন্মদাতা সেই বৃদ্ধ নয়, তখন সে বৃদ্ধকে আঘাত দেবার জন্যেই কথাটা বলেছিল। কথাটার মধ্যে বিন্দুমাত্র সত্য নেই। বৃদ্ধ নিজেও তাই জানে। তবু মানুষের মন তো। মন থেকে কথ াটা একাবারে মুছে যেতে চায় না। তাছাড়া, প্রতিদিনকার প্রীতি - বিনিময় তো ছিলই। আর সহ্য করতে না পেরে বৃদ্ধ একদিন নিদ্দেশ হলো।
ঘরে বুড়ী স্তব্ধ হয়ে থাকে। সে তার মৃত্যুর জন্যে এত আগ্রহ দেখাতো, সে আর কথা কয় না। ... শিশুর মত বলে, আল্লা অ াল্লা।'
'বুড়ী কিছু বলে না। খেলোয়াড় চলে গেছে। খেলবে কার সাথে। তাই যেন চুপচাপ থাকে।'
৫৯ পৃষ্ঠায় আমরা খবর পাই, সাথিহারা বৃদ্ধা মরে গেছে।
এবার বৃদ্ধাস্য মজিদের তণী ভার্য্যা জমিলার প্রসঙ্গে আসাযাক।
৭ পৃষ্ঠায় মজিদ এই বলে জমিলাকে নসিহত দিচ্ছে 'মুসলমানের মাইয়ার হাসি কেউ কখনো হুনে না। তোমার হাসিও জা

নি কেউ হুনে না।'
যাই হোক, কোনো নসিহতেরই সেরকম ক্ষমতা নেই, যা জমিলার হাসি ও কৌতুকপ্রিয়তাকে দমন করতে পারবে।
জমিলার সঙ্গে মজিদের বিয়ে যেদিন পাকা হয়ে গেল সেদিনের স্মৃতিচারণ রহীমার কাছে জমিলা এইভাবে করছে '....আমি ভাবলাম, তানি বুঝি দুলার বাপ।... আর এইখানে তোমার দেইখা ভাবলাম তুনি বুঝি শাশুড়ী।'
জমিলার বয়স ও অভিজ্ঞতা কোনোটাই বেশি নয়। কিন্তু সে চট করে মজিদের আসল পরিচয়টা বুঝে ফেলেছে। তাকে বুঝতে সাহায্য করেছে ৮৯ পৃষ্ঠার বর্ণিত ঘটনাটি
'কোথ্থেকে মাথায় শনের মত চুলওয়ালা খ্যাংটো বুড়ী' মাজারে মাজিদের কাছে এসে, তার সর্বস্ব সাড়ে পাঁচ আনা পয়সা তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে আর্তনাদ করে বলে, আমার মরা ছেলেকে বাঁচিয়ে দাও। মজিদ এই বলে প্রবোধ দেয়, যে খোদার বেশি পেয়ারের হয়, সেই আগে চলে যায়। এই তসল্লি দিয়ে মজিদ অন্দরে চলে যায়। যাবার আগে, বলাই বাহুল্য, পয়সাগুলো কুড়িয়ে নিতে ভোলে না।
জমিলা এই দৃশ্যটি দেখেছে।
তাই ১০৭ পৃষ্ঠায় দেখি, জমিলা 'হঠাৎ সিধে হয়ে মজিদের বুকের কাছে এসে পিচ করে তার মুখের থু থু নিক্ষেপ করলো।'
জমিলার মতো অনভিজ্ঞা নাবালিকা দু'দিনেই মজিদকে চিনে ফেলল। অথচ গ্রামে যত সব ঘড়িয়াল চিনল না? খালেক ব্যাপারী আর অন্যান্য মাতববররা কী করছিলো? শেষ পর্যন্ত তাদের ভক্তি ও বিশ্বাসে সন্দেহের একটি শীর্ণ রেখাও পড়েনি? পড়েছে সে তো আমরা দেখেছি। 'তবু মজিদের মুখোশ খোলে না কেন? সন্দেহ আছে, তবু ভক্তির এত জোর, যে ঝানু মাতববররা পর্যন্ত মজিদের কতায় স্ত্রী-কে তালাক দেয়?
উপন্যাসের শেষের দিকের একটি দৃশ্য।
'লাল কাপড়ে আবৃত কবরের পাশে হাত পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুনে আছে জমিলা, চোখ বোজা, বুকে কাপড় নেই।...আর মেহেদি দেয়া আর একটি পা কবরের গায়ে সঙ্গে লেগে আছে।'
সেই সময় 'শিলাবৃষ্টি শু' হয়েছে, এবং আকাশ থেকে ঝরতে থাকে পাথরের মত খণ্ড খণ্ড অজস্র বরফের টুকরো। কারণ শয়তানকে তাড়াবার জন্যেই তো শিলা ছোঁড়ে খোদা।'
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, যিনি আমাদের উপন্যাসে আধুনিক মনস্কতার জনকরূপে খ্যাতি লাভ করেছেন, তিনি কি তাই -ই বিশ্বাস করেন? ঠিক এই সময়টাতেই তিন অমন ঝড়-বৃষ্টি-বজ্র নাবালেন কেন?
যাই হোক, শয়তানটা কে? জামিলা?
উপন্যাসটি শেষ হচ্ছে এইভাবে?
মজিদকে দেখে 'কে একজন হাহাকার করে উঠে বলে--- সব তো গেলো। এইবার নিজেই বা খামু কী, পোলাপানদেরই বা দিমু কী?'
মজিদ বলে, 'নাফরমানি করিও না। খোদার উপর তোয়াক্কল রাখো
একেবারে শেষ কটি লাইন এই
'এরপর আর কারো মুখে কথা জোগায় না। সমানে ক্ষেতে ক্ষেতে ব্যাপ্ত হয়ে আছে ঝরে পড়া ধানের ধবংসস্তূপ। তাই দেখে চেয়ে চেয়ে। চোখে ভাব নেই। বিশ্বাসের পাথরে যেন খোদাই সে চোখ।'
ঠিক এই সময়টাতেই ওয়ালীউল্লাহ্ ঝড়বৃষ্টি নামলেন কেন -- প্রশ্নটা করে রেখেছি। মজিদ এতোদিন ধরে যে পাপ করে এসেছে, বা মাজারের গায়ে পা ঠেকিয়ে জমিলা যে গুনাহ করেছে -- তার কোনো একটির বা দুটির জন্যেই, গজব? না সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সেরকম কিছু সত্যিই বলতে চাইবেন, শেষ পর্যন্ত আমি তা বিশ্বাস করি না। তাহলে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ কী বলবেন, কেন, ঝড়বৃষ্টি কি হয় না? হ্যাঁ হয়। তবে এই ধরনের একটি উপন্যাসের শেষে বজ্রের শব্দ, শিলার পতন, এবং আদিগন্ত ধবংসস্তূপ, কাহিনিটিকে বেশ জমজমাট করে দেয়।
কিন্তু উপন্যাসের এই শেষ দৃশ্যটিতে অতি প্রাকৃত এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে পাঠকের শিল্পবোধের কাছে অনেকটা প্রশ্ন দাবি করে। এবং কাহিনিটিকে একটি বিশেষ অর্থ দিতে পারে।
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ -এর কথকতার মধ্যে একটা 'মোমেন্টাম' আছে। কিন্তু তাঁর ভাষা আরো আধুনিক ও আরো ভালো

হওয়া সম্ভব ছিল। সম্পূর্ণ অসুয়ামুক্ত এই উক্তি। কথাটা করজোড়ে বলে রাখলাম। কারণ প্রায়ই দেখেছি, মত একটা মতলব।

তাই পুষ্পিকার মতো এই যোজনা।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com